চতুর্দশ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১-সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১-এর ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচারকাজ শুরু করে। প্রহসনের বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরেও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কি-না তাও দেশের মানুষ জানত না। বঙ্গবন্ধুর জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত ছিল সারা দেশের মানুষ। অধীর অপেক্ষা, কবে আসবেন মহান নেতা, অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন। এই অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা -

- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব;
- দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা (স্বদেশ প্রত্যাবর্তন)

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরার আগে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিশেষ বিমানে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকায় মহান নেতাকে জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। ভালোবাসায় সিক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু। নিজে কাঁদলেন, জনতাকেও কাঁদালেন। অবিসংবাদিত নেতার প্রতি জনগণের আবেগময় অভিনন্দন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরাতন বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত হয় প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য।

রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের আশুকরণীয় ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা।'

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার ধরন কী হবে, এই সম্পর্কে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিনই ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশে

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

এই ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আস্থার পরিচয় বহন করে। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হয়। এই সরকার মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়। এই স্বল্পতম সময়ে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক ভাবমূর্তি নির্মাণে অনন্য সাধারণ অবদান রাখেন।

যুদ্ধের পর কীভাবে দেশ গড়ে তোলা হলো

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আক্ষরিক অর্থে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে বঙ্গবন্ধু সরকার। পাকিস্তান বাহিনীর 'পোড়ামাটি' নীতির কারণে বাংলাদেশ ভূখণ্ড এক বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়। প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো সবকিছুই ছিল বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত ও ভুটান ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস গণহত্যা, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি সম্পদ বিনষ্টের এক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। সারা দেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রাসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রামীণ হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়।

পরিকল্পিতভাবেই পাকিস্তানিবাহিনী যোগাযোগব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেয়। ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিন, বগি ও রেল লাইনেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মাইন পুঁতে রাখার কারণে নৌবন্দরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত কাগজের নোটগুলো জ্বালিয়ে দেয়। গচ্ছিত স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। ফলে ব্যাংকগুলো তহবিলশূন্য হয়ে পড়ে।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে সরকার। প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় রেডক্রস সোসাইটি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে জেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সরকারি হিসেবে মাসিকভিত্তিক এক চাহিদাপত্র তৈরি করা হয়। এতে প্রতি মাসে খাদ্যের প্রয়োজন ছিল দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টন, সিমেন্টের চাহিদা এক লক্ষ টন, ঢেউটিন লাগবে পঞ্চাশ হাজার টন, কাঠের প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টন এবং ওষুধসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা ছিল দুই লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারপ্রধান হিসেবে ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সরকারের জরুরি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য প্রদানের উদার আহ্বান জানান।

দলীয় কাজ ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশে কী ক্ষতিসাধন হয়েছিল তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

উন্নয়ন, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

কৃষির উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভলশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন,

ক) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন।

খ) একটি পরিবার সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন।

গ) বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু মানবসম্পদের উন্নয়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬এ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুননির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর ফলে এসব স্কুলে কর্মরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার শিক্ষককের চাকরিও সরকারি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিক্ষকদের পাওনা ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।

সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের মধ্যে দেশের যোগাযোগব্যবস্থা একটা সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। ঢাকা-আরিচা সড়কের বড় বড় সেতুসহ ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য রেল সেতু ও চালু হয়। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রুটে বিমান চালু, তেজগাঁও বিমানবন্দর ব্যবহার উপযোগী করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চের মধ্যে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও কুমিল্লার বিমান যোগাযোগ কার্যকর হয়। ঢাকা-লন্ডন রুটে ১৯৭৩ সালের ১৮ই জুন প্রথম ফ্লাইট চালু হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা

নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

কাজ ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সংবিধান প্রণয়ন ১৯৭২

পটভূমি

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এই দলিল লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ এই সংবিধান লাভ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। দুই বছরে ভারত সংবিধান প্রণয়নে সফল হলেও পাকিস্তানের সময় লেগেছে নয় বছর, তাও তা কার্যকর হয়নি। অপরপক্ষে মাত্র নয় মাসে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা আর জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থেকে বিশ্বের অন্যতম সংবিধান প্রণীত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩এ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬এ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র কাজ।

এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচন করে। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ উল্লাহ। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেন এই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৪। কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ই অক্টোবরের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কাজ শেষ করেন। ১৯এ অক্টোবর থেকে সংবিধান বিল সম্পর্কে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ এর ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২-এর সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সংবিধান রচিত হয়। তবে, বাংলাকে মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল ছিল।

সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন ও একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে।

১. **সর্বোচ্চ আইন ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের সংবিধান। তাই সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কেবল সংবিধানের অধীনে থেকে জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঃ** সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়– '... যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়বাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

ক. **জাতীয়তাবাদ ঃ** পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এর বিপরীতে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম। অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

খ. **সমাজতন্ত্র ঃ** বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সব সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূলত শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল এর লক্ষ্য।

গ. **গণতন্ত্র ঃ** পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায়নি। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হবে।

ঘ. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা। কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না। প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

৩. **মৌলিক অধিকার ঃ** নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা থাকা জরুরি। যেন ব্যক্তি স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. **এককেন্দ্রিক সরকার ঃ** এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে কোন প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়।

৫. **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ঃ** সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ি থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত থাকে।

৬. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ ঃ** সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৫ জন সদস্য নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হবে। আইন পরিষদ জাতীয় সংসদ বলে অভিহিত হবে।

৭. **দুষ্পরিবর্তনীয় :** এই সংবিধান সংশোধন সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতো সহজ নয়। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে। ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেবেন। ৭ দিন অতিক্রান্ত হলে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

৮. **স্বাধীন বিচার বিভাগ :** সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি স্বাধীনভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন।

৯. **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ :** সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে মিল রেখে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের নামে কেউ যেন বিভেদ তৈরি করতে না পারে সে বিষয়ে সংবিধানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নতমানের এবং সুলিখিত দলিল এই সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের বিধানাবলির মধ্যে। নবীন রাষ্ট্রের পথচলার ক্ষেত্রে মূলনীতিসমূহ আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

দলীয় কাজ ঃ ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে এ সংবিধান সম্পর্কে তোমাদের মতামত পোস্টারে লিখে উপস্থাপন কর।

বৈদেশিক সম্পর্ক

তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভারত ও ভুটান ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত ঃ স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়ত ঃ দেশ পুনর্গঠনে বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

নবীন রাষ্ট্রটির পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। তিনি সব সময় স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতির দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সুইজারল্যাণ্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' ১৯৭২ সালের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, পাকিস্তানের বৈরি প্রচারণায় মুসলিম বিশ্বসহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫এ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা লাভ করে নতুন মর্যাদা। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। দেশ দুইটি হলো চীন ও সৌদি আরব। দুইটি দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বঙ্গবন্ধু আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। চীন ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে শুরু করে। স্বীকৃতি না দিলেও চীন বাণিজ্যিক চুক্তি করে এবং বন্যার্তদের জন্য বাংলাদেশে সাহায্য প্রেরণ করে।

জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

অন্যদিকে বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে বিরাট সংখ্যক মুসলিম দেশের সমর্থন অর্জন করে। যদিও সৌদি আরব স্বীকৃতি দেয়নি। তথাপি, কূটনৈতিক যোগাযোগের ফলে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুতরাং, ঘটনাপ্রবাহের বিবেচনায় বলা যায়, চীন ও সৌদি আরবের স্বীকৃতি কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

বঙ্গবন্ধু সরকার বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করায় ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ভারত সরকার বিমান, জাহাজ থেকে শুরু করে খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সাহায্য ও অনুদান হিসেবে প্রদান করে। ১৯৭২ এর জুন মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৬৭.০১ ভাগ প্রদান করে ভারত। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশকে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় থেকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। তৃতীয় বিশ্বের বিদেশি সাহায্য গ্রহণকারী একটি রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রদান করে।

কিন্তু বাংলাদেশের চাহিদা ছিল আরও ব্যাপক। ভারতের সাধ্যের মধ্যে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল না। অধিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য পুঁজিবাদী ও মুসলিম দেশগুলোর ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় বঙ্গবন্ধু সরকার প্রথম দিকে মার্কিন সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের স্বার্থে পুঁজিবাদী ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৩০টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করে। এ ছাড়া জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গণতন্ত্রের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় নির্বাচনী ফলাফল স্বাভাবিক বলেই জনগণ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭৩-এর ১৬ই মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন

১৯৭৫ সালের ২৫এ জানুয়ারি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন। এছাড়া বাংলাদেশের জন্য জাতীয়ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কর্তৃত্বও রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের পর অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাতিল ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে। ১৯৭৫ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের চেয়ারম্যান হলেন বঙ্গবন্ধু এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন এম. মনসুর আলী।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারব্যবস্থার পরিবর্তন নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয়, এর ফলে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব হয়, রাষ্ট্রপতিকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং একক রাজনৈতিক দল গঠন করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু নতুন সরকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলার জরুরি পরিস্থিতি

মোকাবেলায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার নজির রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে নতুন সরকার পুরোপুরি কাজ করার পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থার ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়নি।

১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। ঘাতকরা এই দিন জাতির পিতা ও পাঁচ পরিবারের সদস্যদের নিমর্ম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। শিশু রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি ঘাতকের বুলেট। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠা খুনিরা ছিল সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্য। পর্দার অন্তরালে ছিল সামরিক ও বেসামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা। ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের তারাই ছিল সুবিধাভোগী। দেশি-বিদেশি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির এমন অরক্ষিত বাড়িতে বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে তিনি কখনো শঙ্কিত ছিলেন না। অবিচল আস্থায় বলতেন, 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না।'

১৫ই আগস্ট, সেদিন ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে ঢাকা। জাতির পিতা সপরিবারে ঘুমিয়ে আছেন ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের ৬৭৭ নং বাড়িতে। ঘাতকের দল ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। টার্গেট বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করা। আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ শুরু হয়। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে।

জোর করে খুনির দল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করল। তখন ভোরের আলো অনেকটা পরিষ্কার। গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত ধানমন্ডির অধিবাসীরা। নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির পিতার পরিবারের ওপর।

চিৎকার, হট্টগোল আর গুলির শব্দে ঘুম ভাঙে বঙ্গবন্ধু পরিবারের। একে একে হত্যা করে প্রতিটি সদস্যকে। শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি। একজন ঘাতক শেখ রাসেলকে ঘরে উপরতলা থেকে নিচে নিয়ে আসে। ভয়ে কাতর, বিহবল হয়ে পড়ে ৮ বছরের শিশু রাসেল। মায়ের কাছে যাবার জন্য কাঁদতে শুরু করে। নিষ্ঠুর ঘাতক রাসেলকে উপরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। স্টেইনগান থেকে বঙ্গবন্ধুর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে ঘাতকের দল। তাঁর বুকে ১৮টি গুলির আঘাত পাওয়া যায়। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল। পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবি সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপরও বাংলাদেশের রূপকার, এদেশের সব মানুষের অতিপ্রিয় নেতাকে এভাবে জীবন দিতে হলো। এমনি করুণ, নির্মম, হৃদয়বিদারক হত্যার নজির বিশ্ব ইতিহাসে নেই বললে চলে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ষড়যন্ত্রে দেশি-বিদেশি চক্র এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিল। খুনি চক্রের নেতৃত্বে ছিল খন্দকার মোশতাক আহমদ। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কারণে বিশ্বের চোখে আমরা কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। ক্ষমতা দখলকারীরা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় কয়েকটি পঙ্কতির মধ্য দিয়ে সে কথাই বলেছেন,

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'

একক কাজ ঃ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত অধ্যায়–উদ্ধৃতির যথার্থতা নিরূপণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল

বঙ্গবন্ধু নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। খুনিচক্রের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোশতাক আহমদ। অবৈধ ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য তখন প্রথম স্বাধীন দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের কত তারিখে গ্রেফতার হন?

ক. ২৫এ মার্চ খ. ২৬এ মার্চ
গ. ২৭এ মার্চ ঘ. ২৮এ মার্চ

২. বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব কেন পালন করেন?

ক. সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে খ. দেশ পুনর্গঠনের জন্য
গ. রাজাকারদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ঘ. স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্রের রমেশ, আবদুল্লাহ, লিন্ডা গোমেজ ও অমল বড়ুয়া সবাই তাদের পূজা, ঈদ, বড় দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে ধুমধাম করে পালন করে। এসব অনুষ্ঠান উদযাপনে রাষ্ট্র কাউকে কোনো বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না।

৩. 'ক' রাষ্ট্রে ১৯৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. গণতন্ত্র খ. ধর্মনিরপেতা
গ. জাতীয়তাবাদ ঘ. সমাজতন্ত্র

৪. এ বৈশিষ্ট্য মানুষকে দেয়

ক. ধর্মীয় স্বাধীনতা খ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ. সামাজিক স্বাধীনতা ঘ. সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. রাসেলের বিদেশি বন্ধু রবার্ট বাংলাদেশে এসে মুগ্ধ। এদেশের সবুজ প্রকৃতি তার খুব পছন্দ হয়। তবে রবার্টের খুব কষ্ট লেগেছে বড় বড় দালানের পাশে নোংরা বস্তি দেখে। তাদের দেশে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাদের সংবিধানের মূল লক্ষ শোষণহীন সমাজ গঠন। রাসেল বলে, আমাদের সংবিধানে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয়। জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তবে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

ক. বঙ্গবন্ধু কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ?

খ. বঙ্গবন্ধু কেন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন?

গ. রবার্ট এর দেশে ৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রাসেলের কথায় ৭২ এর সংবিধানের আংশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে'- মূল্যায়ন কর।